মধুসূদন: আমাদের নবজাগরণের বহুবর্ণের আলো

শুভময়

এই লিখনটি যখন অক্ষর পেতে শুরু করেছে সবে, কলকাতার রাত ভারী হতে সবে জুড়োতে শুরু করেছে শহর ও শহরতলিতে আতশ ও শব্দবাজির দাপট; সবে নরম হয়েছে নানা পথের পাশে বাঁকে নানা মন্দিরে ডিজেতে বেজে ওঠা উৎকট ধর্মগীতির ভয়ানক আওয়াজ; দিনের কলকাতা দেখেছে বাইকে অটো-রিকশয় রামমন্দিরের নকশাওয়ালা গেরুয়া পতাকার আস্ফালন উড়ান আর শিকারি পাখির নখের মতো ক্রুদ্ধ হনুমানের মুখের দেদার ছবি। রাষ্ট্র বুনেছে এই উন্মাদনা তার যাবৎ প্রতাপ, বিত্ত ও ক্ষমতাযন্ত্রের ব্যবহারে যার ঘোলা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল আমাদের এই বাংলাতেও।

তখনই মনে পড়ে যায়, যাবেই,– আমাদের কবিতায়, আমাদের সাহিত্যে নবজাগরণের শুরু হলো এমন এক বাঙালি কবির হাত ধরে যিনি তাঁর মহাকবিতার মাঝখানে রাখলেন রামের মতো প্রচলিত নায়ককে নয়, রামের প্রতিস্পর্ধী বিপরীতে থাকা এক প্রতিনায়ককে এবং সেই প্রতিনায়কের দুঃসাহসী পুত্রকে। এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নবজাগ্রত বাঙালি দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণও করেছিল সে মহাকবিতা জনতার আনন্দে। পুরোটাও নয়, তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড, ছ'বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার বিদ্বোৎসাহিনী সভা ১২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধেবেলা সভা ডেকে সংবর্ধনা জানালো কবিকে।

খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত বাঙালি কবিকে স্পষ্ট শব্দে জানিয়ে দিল: 'আপনি বাংল্লা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন,..'। কে আদিকবি? বাল্মীকি। বেদব্যাস। অথবা বাংলা ভাষার কাশীরাম, কৃত্তিবাস। সেদিনের বাঙালি তাঁদের পাশে রাখল আর একজনের নাম– শ্রীমধুসূদন। সে আমাদের উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের মহত্তম উত্তরণ-চিহ্ন – জন্মগত পরিচয় নয়, ধর্মগত পরিচয় নয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ, গুণপনা ও কর্মের সমুন্নতিকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্পণ করা। এই সংবর্ধনাসভার নেতৃত্বে ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। যিনি কিছুদিনের মধ্যেই শুরু করবেন বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন সিংহ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুররা বাল্মীকি-বেদব্যাস-কাশীরাম-কৃত্তিবাসদের পাশের আসনেই বসাতে চাইছেন খ্রিস্টান মাইকেল মধুসূদনকে। আর বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন-প্রয়াণের পর শ্রীচৈতন্যদেব, রঘুনাথ, জয়দেব গোস্বামীর পাশেই পেতেছেন মধুসূদনের জন্য আসন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল মধুসূদন দত্তকে প্রদত্ত সংবর্ধনাপত্রের পূর্ণ বয়ান। সে গদ্য হয়তো কালীপ্রসন্নেরই বয়ন। সেখানে বলা হয়েছিল : 'পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক,...।' দুনিয়ার দেশে দেশে নবজাগণের প্রথম আলোর পরাগ ছড়িয়ে পড়ে দেশজ ভাষার বিকাশ-আকাঙ্ক্ষায়। দেশজ ভাষার বিকাশই, এরিক হবসবাম আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, জাতীয় ঐক্য ও মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম লক্ষণ।

সে আপাতত অন্যতর প্রসঙ্গ। আমরা বলেছিলাম, যিনি রামের দুশমনকেই নায়ক পদে বরণ করে নিলেন তাঁকে গ্রহণে বাঙালির জনতার আনন্দের কথা। এতটুকু বাড়িয়ে বলা কথা নয়, উৎপল দত্তের সেই মহত্তর নাটক থেকে গ্রহণ করা দৃশ্যও নয়। মধুসূদন নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন না-এলিট জনতার মেঘনাদবধ-মগ্নতা নিয়ে।

১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ১৮ তারিখে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন চিঠি লিখে শুনিয়েছেন সে অভিজ্ঞতা: চীনাবাজারের এক দোকানি একমনে ঝুঁকে আছেন মেঘনাদবধ কাব্যর উপর। দোকানে ঢুকে মধুসূদন যাচাই করে নিতে চাইলেন এ-দৃশ্য। দোকানিকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি পড়ছেন? বেশ ভালো ইংরেজিতেই দোকানদার বললেন, 'একটা নতুন কবিতা, মহাশয়'। 'কবিতা!' বিস্ময়ের ভান করে মধুসূদন বললেন,'আমার তো ধারণা আপনাদের ভাষাতে কোনও কবিতাই নেই।' দোকানি উত্তর দিলেন, 'কেন থাকবে না মহাশয়! এই তো আমি একটি কবিতা পড়ছি যা যে কোনও জাতিকেই গর্বিত করবে।' মধুসূদন বললেন,' বেশ পড়ুন, কেমন শুনি।' দোকানদার বেশ কড়া চোখে তাকালেন মধুসূদনের দিকে (নিশ্চয় সাহেবি পোশাক পরা মধুসূদনের দিকে), তারপর

বললেন, 'আমার মনে হয় এই লেখককে আপনি বুঝতে পারবেন না। 'মধুসূদন উত্তর দিলেন, 'বেশ তো, আমায় একটা সুযোগ দিন।' দোকানদার পড়তে শুরু করলেন, মেঘনাদবধ কাব্য-র দ্বিতীয় সর্গ থেকে। চীনাবাজারের দোকানদারের হাতে মেঘনাদবধ কাব্য– মধুসূদনের কাছে কেন, এ-দৃশ্য বাঙালির চিরকালের অহঙ্কারের দৃশ্য। মধুসূদন বোধহয় আন্দাজ করেছিলেন, এমনটাই ঘটতে চলেছে, এমনটাই ঘটা সঙ্গত, এমন করেই বাঙালি জনতা গ্রহণ করছে রাবণের পিতৃত্বকে, মেঘনাদের দেশপ্রেম আর মেঘনাদ-প্রমীলার হতভাগ্য দাম্পত্য প্রেমকে। আরও ছ'মাস আগেই (১৫ জানুয়ারি ১৮৬১) তিনি রাজনারায়ণকে বলেছেন, 'আমি বুঝতে পারি, অনেক হিন্দু মহিলা এই বই পড়ছেন আর কাঁদছেন।'

মধুসূদন দত্তের দ্বিশতজন্মবর্ষ-পূর্তির তিন দিন আগে বাংলায়, কলকাতায় যা ঘটে গেল গেরুয়া পতাকায় মন্দির-ছাপের আস্ফালনে, ক্রুদ্ধ হনুমান মুখের উড়ানে, ডিজের উৎকট তারস্বরে– বাংলা কি তার নবজাগরণের ঐতিহ্যকে খানিকটা হলেও অস্বীকার করল, তার জনতার একাংশে সে ঐতিহ্য খুন হয়ে গেল ক্রমশ এবং সহসা ?

২

১৮৬১ সালের ১৫ জানুয়ারির আশপাশের সেই চিঠিতেই, সাত দিনের টানা জ্বর থেকে সবে তিনি উঠেছেন, মধুসূদন লিখছেন, 'আমার মধ্যে একটা লড়াই চলছিল মেঘনাদ আমাকে শেষ করবে, না আমি তাকে শেষ করব। থ্যাঙ্ক হেভেন। আমি জিতে গেছি। সে মৃত,.. আমাকে অনেক চোখের জলের দাম দিতে হয়েছে তাকে খুন করতে।'

মধুসূদনের ইংরেজি চিঠিগুলির অক্ষম এইসব অনুবাদ মার্জনীয়। শুধু মনে করে নেব, মধুসূদন সচেতন ছিলেন তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে না-হিন্দুত্বের অভিযোগ উঠতে পারে, রাজনারায়ণকে লিখেওছিলেন সে-কথা, 'আমি তো গ্রিক গল্প থেকে ধার করব না, কিন্তু লিখব, বরং বলা ভালো, লিখতে চেষ্টা করব, যেমন করে একজন গ্রিক লেখে।'

ইউরোপীয় রেনেসাঁস কেমন করে গ্রিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছিল, কেমন করে ফিরে এল গ্রিক উত্তরাধিকার, তার অসামান্য সূত্রায়ন করেছিলেন ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বিকতা'-য়। সে প্রসঙ্গে আপাতত যাওয়ার সুযোগ নেই। আমরা শুধু এইটুকু বলে নেব, আরিস্ততলের আদর্শ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লেস, তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি গড়ে তুললেন তাদের ঘিরেই যারা তাদের আদর্শের জন্যে হেরে যাবে, হেরে যেতে বাধ্য, পরাজিত হওয়াই যাদের পরিণতি। সোফোক্লেসের 'রাজা ওয়াইদিপাউস', 'আন্তিগোনে, ইউরিপাইদেস-এর 'হেকুবা' অথবা 'ত্রোয়াদেস' – পরাজিত ট্রয়ের সেই হতভাগ্য নারীরা– সবাই, সবাই। এঁদের জন্যে ওই নাটককারদের নিশ্চয় অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছিল। তবু এঁদের সকলকে, সোফোক্লেস, ইউরিপাইদেসকে ফেলে কার্ল মার্কসের প্রিয় নাট্যকার এস্কাইলাস। কেন? বোধহয় তিনি প্রমিথিউসের স্রষ্টা বলে।

প্রমিথিউস! প্রমিথিউস! মার্কসের চিরদিনের প্রিয় চরিত্র। নবীন বয়স থেকেই। যার বিদ্রোহ দেবতাদের বিরুদ্ধে, সমগ্র স্বর্গতন্ত্রের বিরুদ্ধে। দেবতাদের বিরুদ্ধে মানবের পক্ষ নেওয়ার জন্যেই যে হেরে যাবে অনন্ত পরাজয়ে। তাঁর সেই ডক্টোরাল সন্দর্ভপত্রেই কার্ল লিখেছিলেন প্রমিথিউস কথা, এস্কাইলাসের নাটক থেকে সরাসরি গ্রিক ভাষাতেই উদ্ধৃত করেছিলেন প্রমিথিউসের সংলাপ: 'দাসত্বের বিনিময়ে আমি আমার হতভাগ্যকে বদলাতে চাইব না।' মার্কস লিখেছিলেন, 'আমাদের দার্শনিক দিনপঞ্জিতে প্রমিথিউস-ই সবথেকে বিশিষ্ট সন্ত, প্রথম শহীদ'।

আমাদের কি মনে পড়ে যাবে, মৃত্যুর আগে দাসত্বের বিরুদ্ধে মেঘনাদ ইন্দ্রজিতের সংলাপগুলি: 'কোন ধর্মমতে, কহ দাসে,শুনি'/ জ্ঞাতিত্ব,ভ্রাতৃত্ব, জাতি– সকলে দিলা / জলাঞ্জলি ?' ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদই স্বদেশের মানবের জন্যে আমাদের কবিতার প্রথম উজ্জ্বলতম চরিত্র, ধর্মীয় ক্ষমতাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে প্রথম শহীদ। মেঘনাদই আমাদের প্রমিথিউস।

৩.

শুধু মেঘনাদ কেন,তাঁর কবিতাজীবনের শুরু থেকেই মধুসূদনের পূর্ণ পক্ষপাত হেরে-যাওয়া মানুষদের দিকে – ইংরেজি কবিতায় ছিলেন পুরু কিংবা সুলতানা রিজিয়া। রাজা পুরু আর ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী আলেক্সজান্দারের সেই মুখোমুখি মোলাকাত বর্ণনের পর মধুসূদন তাঁর উনিশ বছর বয়সে লেখা কবিতায় বলে উঠছেন: 'কিন্তু হায়! এখন পুরু কোথায়? / অ্যান্ড হোয়ার দ্য নোবল হার্টস দ্যাট ব্লিড ফর ফ্রিডম–?' মধুসূদনের কবিতাতেই আমাদের দেশমুক্তির প্রথম আকাঙ্ক্ষা?

পরাজিত মানুষগুলিকে নিয়েই তিনি তাঁর কবিতায় গড়ে তুলতে চাইছেন বাস্তবতার মাটি, সমুন্নত কল্পনার আকাশ। আমাদের সাহিত্যে বাস্তবতা আর বীরত্বের কল্পনার যথেষ্ট পূর্ব দৃষ্টান্ত না পেয়ে হতাশা ছিল তাঁর, বন্ধু কেশব গাঙ্গুলিকে লিখেছিলেন সে-কথা, ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে, 'মহান ইউরোপীয় নাটকগুলিতে পাবেন জীবনের কঠোর বাস্তবতা, সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষা আর আবেগের বীরত্ব। আমরা ভুলে যাই বাস্তবতার জগৎ আর রূপকথাভূমির স্বপ্ন।' কঠোর বাস্তবতার সাবুদ যদি খুঁজতে হয় পাতা ওলটানো যেতে পারে তার প্রহসনগুলোর।

যিনি মেঘনাদ গড়তে পারেন তিনিই দু'হাতে মাটির তাল নিয়ে গড়ে ফেলেন হানিফ গাজী যে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে সরোষে বলে ওঠে, 'এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দু'জন আছে ? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মারে, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তারপর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ আছে কি না'। শোনা যায় এই প্রহসনগুলির জন্যে মঞ্চ পেতে তাঁর নাকি বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। কী ক্রোধে তিনি কেশব গাঙ্গুলিকে লিখেছিলেন,' তোমরা আমরা প্রহসনগুলি নিয়ে একই কৌশলে একবার আমার ডানা ভেঙে দিয়েছিলে। এবার যদি একই খেলা খেলো, আমি শপথ করছি, বাংলায় লেখা ছেড়ে দেব, হিব্রু কিংবা চীনা ভাষায় লিখব'

ইনসাফের কথাই যখন উঠল, আমরা এখনই বলে নেব: 'তুহফাত' আর নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে বিলকুল বিদ্রোহী হাফেজকে নিয়ে আমাদের নবজাগরণের প্রথম চেরাগে যেভাবে আগুনের পরশমণি দিলেন রামমোহন রায় তার বহুবর্ণের আলো সবথেকে উজ্জ্বল বিকশিত হয়েছিল শ্রীমধুসূদনে। সুলতানা রিজিয়াকে নিয়ে তিনি কবিতা শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে। 'শর্মিষ্ঠা' লেখার পর যখন তিনি নতুন নাটক লেখার কথা ভাবছেন, বন্ধু কেশব গাঙ্গুলি লিখছেন, 'এখনই আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের বিষয় করে নেওয়া উচিত।' ১৮৬১ সালের ১৪ জুন সেবার বোধহয় পড়েছিল মহরম, তিনি প্রার্থনা করছেন, মুসলমানদের মধ্যে থেকে শক্তিশালী নতুন কবি উঠে আসুক যিনি হোসেন আর তার ভাইয়ের মৃত্যু নিয়ে মহত্তর মহাকাব্য লিখবেন।

বাংলার নবজাগরণের চেতনার পূর্ণ প্রতিনিধি তিনি ইউরোপের সমগ্র ভাষা ও সাহিত্য থেকে এনেছিলেন আধুনিকতা আর বাস্তবতার আগুন এনেছিলেন বাংলা ভাষার জন্যে। তিনিই বা অত সহজে পার পেয়ে যাবেন কীভাবে! বিক্ষত হয়েছেন বারংবার। মুখ দিয়ে রক্ত তুলতে তুলতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করেছেন পরের আশ্রয়ে এবং হাসপাতালে। যে খ্রিস্টান ধর্ম তিনি গ্রহণ করেছিলেন অনেক বিরোধিতায়, তাদেরই আক্রোশে হতভাগ্য মৃত্যুর পর কবরের মাটি জুটছিল না তাঁর। ভরা গ্রীষ্মেও তাঁর মৃতদেহ পড়েছিল মর্গের দুর্গন্ধে। টানা।

শুধু তাঁর মেঘনাদ নয়, মধুসূদনও আমাদের প্রমিথিউস।